হে মহাজীবন! হে মহামরণ!

আমার চিন্তাধারা

বর্তমান সময়ের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টিপাত করে আমি আমার কিছু চিন্তা-ভাবনা প্রকাশ করছি। আমার নাম করে কোনো ব্যক্তিকে এই চিন্তাধারা তথা সিদ্ধান্তগুলির বিরুদ্ধ আচরণ করতে দেখলে তাকে যেন যথাশক্তি বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়,—এই আমার ইচ্ছা।

আমার দীক্ষাগুরুর দেহান্তের পর বিক্রম সংবৎ ১৯৮৭ (তদনুসারে বাংলা ১৩৩৭ সালে) তে যখন আমি তাঁর বাৎসরিক ক্রিয়া সম্পন্ন করি, তখনই আমি এই স্থির সিদ্ধান্ত করি যে, এখন একমাত্র তত্ত্বলাভ ব্যতীত অন্য কিছুই আমার করণীয় নেই। আমি কারো কাছে কিছু চাইব না। টাকা-পয়সা নিজের কাছে রাখব না, এমনকী স্পর্শও করব না। নিজের থেকে কোথাও যাব না, যার ইচ্ছা বা প্রয়োজন হবে, সে নিয়ে যাবে। এর পরে আমি গীতা প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীজয়দয়ালজী গোয়েন্দকার সংস্পর্শে আসি। আমার ধারণায় তিনি ভগবৎ-সাক্ষাৎকার-প্রাপ্ত মহাপুরুষ ছিলেন। আমার জীবনে তাঁর বিশেষ প্রভাব পড়েছে।

আমি কোনো ব্যক্তি, সংস্থা, আশ্রম ইত্যাদির সঙ্গে কোনো ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করিনি। যদি কোনো কারণে কোথাও কিছু সম্পর্ক হয়েও থাকে, তাহলেও তা ছিল স্বল্পকালের জন্য, অস্থায়ী, বরাবরের জন্য নয়। আমি চিরদিনই তত্ত্বের অনুগামী থেকেছি, ব্যক্তির নয়।

সর্বদাই আমার এই মানসিকতা ছিল যে, মানুষ আমার অথবা কোনো ব্যক্তিবিশেষের প্রতি অনুরক্ত না হয়ে ভগবানের প্রতি অনুরক্ত হোক। আমি অত্যন্ত কঠিনভাবে ব্যক্তিপূজার বিরোধী।

আমার কোনো স্থান, মঠ অথবা আশ্রম নেই। আমার কোনো গদিও নেই এবং আমি কাউকে নিজের শিষ্য, প্রচারক বা উত্তরাধিকারীও করিনি। **আমার পরে আমার পুস্তকগুলিই সাধকদের পথপ্রদর্শক হবে।** গীতা প্রেসের পুস্তকসমূহের প্রচার, গোরক্ষা এবং সৎসঙ্গের আমি বরাবরই একজন উৎসাহী সমর্থক।

আমার চিত্র (ফটো) গ্রহণ, চরণ স্পর্শ করা, জয়ধ্বনি উচ্চারণ বা আমাকে মালা পরানো ইত্যাদি আমি অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষেধ করে থাকি।

আমি প্রসাদ অথবা উপহাররূপে কাউকে মালা, উত্তরীয়, বস্ত্র, কম্বল প্রভৃতি প্রদান করি না। আমি নিজেই ভিক্ষা দ্বারা জীবন ধারণ করি।

সৎসঙ্গ-কার্যক্রমের জন্য অর্থ-সংগ্রহের (চাঁদা আদায়) আমি বিরোধিতা করি।

আমি কাউকেই আশীর্বাদ/অভিশাপ অথবা বরদান করি না এবং নিজেকে এর যোগ্য বলেও মনে করি না।

আমাকে দর্শন করা অপেক্ষা গঙ্গাদেবী, সূর্যদেব অথবা ভগবদ্বিগ্রহের দর্শনকে আমি অনেক বেশি গুরুত্ব দিই।

টাকা-পয়সা এবং স্ত্রীলোক—এই দুইয়ের স্পর্শ আমি সর্বথা ত্যাগ করেছি। যেসব পত্র-পত্রিকা অথবা স্মারক-পুস্তিকার মধ্যে বিজ্ঞাপন ছাপা হয়, সেগুলিতে আমি আমার লেখা প্রকাশ করতে নিষেধ করি। সেই রকমেই নিজ দোকান, ব্যবসা ইত্যাদির প্রচারের জন্য যেসব জিনিষ প্রকাশিত হয় (ক্যালেণ্ডার প্রভৃতি) সেসবের মধ্যেও আমি আমার নাম ছাপতে নিষেধ করি। একমাত্র গীতা প্রেসের পুস্তকাবলির প্রচারের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়।

আমি সৎসঙ্গ (প্রবচন) অনুষ্ঠানে এই নিয়ম রেখেছি যে, পুরুষ এবং মহিলাগণ পৃথক পৃথক বসবেন। আমার সামনে কিছু দূর পর্যন্ত কেবল পুরুষরাই বসবেন। পুরুষদের (বসার) ব্যবস্থা পুরুষরা এবং মহিলাদের ব্যবস্থা মহিলারা নিজেরাই করবেন। কোনো কথায় সমর্থন জানানোর জন্য অথবা ভগবানের জয়ধ্বনি দেবার সময় পুরুষরাই কেবল হাত তুলবেন, মহিলারা নয়।

কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ—এই তিনটির মধ্যে আমি ভক্তিযোগকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করি এবং পরমপ্রেমপ্রাপ্তিতেই মানবজীবনের পূর্ণতা তথা সার্থকতা বলে স্বীকার করি।

যে ব্যক্তি নিজেকে আমার অনুগামী অথবা কৃপাভাজন বলে প্রচার করে মানুষের কাছে সম্মান-সুখ্যাতি অর্জনের চেষ্টা করে, অর্থ গ্রহণ করে, স্ত্রীলোকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, উপহার গ্রহণ করে অথবা দ্রব্যাদি প্রার্থনা করে, তাকে প্রতারক বলে জানতে হবে। যে আমার নামে অর্থ সংগ্রহ করে সে মহাপাপী, তার পাপ ক্ষমার অযোগ্য।

———o———

[শ্রদ্ধেয় স্বামী রামসুখদাসজী মহারাজ গত (চান্দ্র) আষাঢ়ী কৃষ্ণা একাদশী তিথি, খ্রিঃ ৩রা জুলাই ২০০৫ তারিখের ভোর-রাত্রি ৩.৪০ মিনিট নাগাদ পরমধামে প্রয়াণ করেছেন। বিগত প্রায় সোয়া চার বৎসর তিনি ভগবতী গঙ্গানদীর তটে স্বর্গাশ্রম-স্থিত গীতা-ভবনে অবস্থান করছিলেন। এই সময়ে বিভিন্ন স্থান থেকে গীতা-ভবনে আগত ভক্তজন তাঁর সৎসঙ্গের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। শ্রদ্ধেয় স্বামীজী ছিলেন ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রতিমূর্তি, নিজের সম্পর্কে কোনোরকম প্রশংসা বা স্তুতিবাদের ঘোরতর বিরোধী, ফলে তাঁর সম্বন্ধে কোনো কিছু লেখাও উচিত হবে না।

কয়েক বৎসর পূর্বে অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা একাদশী (গীতাজয়ন্তী) তিথির দিন তিনি একটি ইচ্ছাপত্র (উইল) প্রণয়ন করেন—সাধকগণের পক্ষে সেটি অনুকরণযোগ্য। সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে সেটি এখানে প্রকাশিত করা হল।]

ইচ্ছাপত্র (উইল)

[শরীরপাতের পর পালনীয় আবশ্যক নির্দেশ]

ভগবানের অসীম অহৈতুকী কৃপার ফলেই জীব মানবশরীর লাভ করে। এর একমাত্র উদ্দেশ্য ভগবৎপ্রাপ্তি। কিন্তু মানুষ এই শরীর লাভ করে নিজের মূল উদ্দেশ্য ভুলে যায় এবং শরীরের সঙ্গে দৃঢ় তাদাত্ম্য বোধে লিপ্ত হয়ে এর সুখকেই পরম সুখ বলে মনে করে। শরীরকে স্থায়ী বলে মনে করার সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে তার সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ স্বীকার করে নেওয়ার ফলে তার প্রতি তার এমনই মোহ জন্মায় যে, এর নাম পর্যন্ত তার কাছে প্রিয় বলে মনে হতে থাকে। শরীরের সব রকমের সুখের মধ্যে সম্মান-খ্যাতির সুখ সবচেয়ে সূক্ষ্ম। তা পাওয়ার জন্য সে মিথ্যাচার, কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি দুর্গুণ-দুরাচারেও প্রবৃত্ত হতে কুণ্ঠিত হয় না। শরীরের নামের প্রতি আসক্তিবশত তার মনে অপরের কাছ থেকে নিজের প্রশংসা-স্তুতির আকাঙ্ক্ষা জন্ম নেয়। সে কামনা করে, যেন আজীবন সে সম্মান-খ্যাতি লাভ করে এবং মৃত্যুর

পরেও যেন তার নামের কীর্তি ঘোষিত হতে থাকে। লৌকিক ব্যবহারের জন্য শরীরের যে নাম রাখা হয়েছিল, শরীরনাশের পর যে তার আর অস্তিত্ব থাকে না—এই কথাটাই সে ভুলে যায়। প্রকৃতপক্ষে এই দৃষ্টিতে শরীরের পূজা, মান, আদর এবং নামের স্থায়িত্ব-বিধানের চেষ্টা কোনোরূপ মহত্ত্বের স্বীকৃতি পেতে পারে না। কিন্তু শরীরের সম্মান-আদর এবং নামের স্তুতি-প্রশংসার বিষয়টি এমনই ব্যাপক যে মানুষ নিজের এবং নিজের প্রিয়জনের সম্পর্কে তো এগুলির অনুষ্ঠান করেই, এমনকী যাঁরা ভগবদাজ্ঞা, মহাপুরুষবচন এবং শাস্ত্রমর্যাদা অনুসারে অকপট হৃদয়ে নিজেদের লক্ষ্যে (ভগবৎপ্রাপ্তি) অবিচল থেকে এইসব দোষ থেকে দূরে থাকতে চান, সেই সাধকদের সম্পর্কেও এই ধরনের আচরণে প্রবৃত্ত হয়। বেশি আর কী বলা যাবে, সেই সাধকদের শরীর প্রাণহীন হওয়ার পরেও তার স্মৃতিরক্ষার জন্য তাকে চিত্রে আবদ্ধ করা হয় এবং বহুতর সাজসজ্জার সঙ্গে তাকে অন্তিম সংস্কারের স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। বিনাশশীল নামকে অবিনশ্বর করার প্রয়াসে সেই সংস্কার স্থলে ছতরী, মণ্ডপ বা স্মৃতিমন্দির প্রভৃতি নির্মাণ করা হয়। এছাড়াও তাঁদের শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত একদিকের ঘটনাবলিই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তাঁদের জীবনী, স্মৃতিকথা ইত্যাদিরূপে লেখা এবং প্রকাশ করা হয়। যারা এসব করে তারা নিজেদের ওই সাধকদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বলে মুখে প্রচার করে, কিন্তু এইভাবে কাজের বেলায় তাঁরা যেগুলি নিষেধ করেছেন, সেগুলিই করে চলে।

বস্তুত শ্রদ্ধাতত্ত্ব অবিনাশী। সুতরাং সেই সাধকদের চিরন্তন আদর্শ তথা তাঁদের উপদেশসমূহের ওপরেই শ্রদ্ধা রাখা উচিত, নশ্বর দেহ কিংবা নামের প্রতি নয়। বিনাশশীল দেহ তথা নামের প্রতি মোহই হয়ে থাকে, শ্রদ্ধা নয়। কিন্তু যখন মোহই শ্রদ্ধার রূপ ধারণ করে, তখনই এই অনর্থ ঘটে। সুতরাং ভগবানের শাশ্বত, দিব্য, অলৌকিক শ্রীবিগ্রহের পূজা তথা তাঁর অবিনশ্বর নামের স্মৃতিকে ত্যাগ করে এই নশ্বর শরীর তথা নামসমূহের ওপর গুরুত্ব আরোপ করায় কেবল যে নিজের জীবনই ব্যর্থ

হয় তা-ই নয়, উপরন্তু নিজেকে অত্যন্ত গভীরভাবে ছলনা করাও হয়।

বস্তুগত দৃষ্টিতে দেখলে পরে শরীর মলমূত্র তৈরির একটি যন্ত্র ছাড়া কিছুই নয়। একে সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য অথবা ভগবানের প্রসাদও যদি খাওয়ানো হয়, তাহলেও তা মলরূপে নির্গত হয়ে যাবে, আবার সর্বোত্তম পানীয় কিংবা গঙ্গাজলও পান করালে তা-ও মূত্ররূপে নির্গত হবে। যতক্ষণ প্রাণ আছে, ততক্ষণ শরীর মলমূত্র বানানোর যন্ত্র, আর প্রাণ বের হয়ে গেলে তা শবমাত্র, যাকে ছুঁলেও স্নান করতে হয়। বাস্তবিকপক্ষে এই শরীর প্রতিক্ষণেই মরছে, শবে পরিণত হচ্ছে। এরমধ্যে যেটি প্রকৃত তত্ত্ব (চৈতন্য) তার কোনো চিত্র (ফোটোগ্রাফ) নেওয়া সম্ভব নয়। চিত্র নেওয়া যায় সেই শরীরটির যেটি প্রতিমুহূর্তেই নষ্ট হচ্ছে। এইজন্য চিত্র নেওয়ার সময় শরীর যেমন ছিল, পরবর্তী সময়ে তা আর সেরকম থাকে না। ফলে সেই চিত্রের পূজা প্রকৃতপক্ষে 'অসৎ' (অস্তিত্বহীন)-এর পূজাতেই পর্যবসিত হয়। চিত্রে গৃহীত শরীর নিষ্প্রাণ থাকে, অতএব অস্থি-মাংসময় অপবিত্র শরীরের চিত্র তো 'মড়ারও মড়া' বলতে হয়।

আমরা নিজেদের বিচারবুদ্ধি অনুসারে যাঁকে মহাত্মা বলি, তিনি নিজের শরীরের সঙ্গে সর্বথা সম্বন্ধ বিচ্ছেদ ঘটার ফলেই মহাত্মা, অথবা শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকার জন্য ? শরীরকে তো তাঁরা মলের সমান মনে করেন। সুতরাং মহাত্মার তথাকথিত শরীরের সমাদর করা প্রকৃতপক্ষে মলের সমাদর করা বলেই বুঝতে হবে। এটা কি উচিত কাজ ? যদি কেউ বলেন যে, যেমন ভগবানের চিত্রের পূজা প্রভৃতি হয়ে থাকে, তেমনই মহাত্মার চিত্রেরও পূজা-আদি করা হলে আপত্তির কী আছে, —কিন্তু এরকম বলাও সংগত নয়। কারণ ভগবানের শরীর চিন্ময় এবং অবিনশ্বর, অপর দিকে মহাত্মার তথাকথিত শরীর পাঞ্চভৌতিক হওয়ার ফলে জড় এবং বিনাশশীল।

ভগবান সর্বব্যাপী, অতএব চিত্রের মধ্যেও তিনি আছেন, কিন্তু মহাত্মার সর্বব্যাপকতা (শরীরের থেকে পৃথকরূপে) ভগবানের সর্বব্যাপকতারই অন্তর্গত। সকল মহাত্মাই এক ভগবানের অন্তর্গত,

সুতরাং ভগবানের পূজা করলে তাঁর অন্তর্গত সব মহাত্মার পূজাই স্বত অনুষ্ঠিত হয়ে যায়। যদি মহাত্মাগণের অস্থি-মাংসময় দেহের তথা তাঁদের চিত্রের পূজা করা হতে থাকে, তাহলে তার দ্বারা পুরুষোত্তম ভগবানের পূজাতেই বাধার সৃষ্টি করা হয়, যা সেই মহাত্মাদের অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত। মহাত্মারা তো সংসারে আসেন সাধারণ মানুষকে ঈশ্বরাভিমুখী করে তোলার জন্যই, নিজের দিকে তাদের আকৃষ্ট করার জন্য নয়। যারা মানুষকে নিজের (ধ্যান-পূজাদির দ্বারা) অনুগামী করে তোলেন, তারা তো ভগবদ্বিরোধী। প্রকৃত মহাত্মারা কখনো শরীরের মধ্যেই সীমিত থাকেন না।

যে জীবনী বা চরিত্রচিত্রণ সাঙ্গোপাঙ্গ বা সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ—অর্থাৎ যার মধ্যে জীবনের ভালো-মন্দ (সদ্‌গুণ, দুর্গুণ, সচাদার, দুরাচার প্রভৃতি) সকল দিকই যথার্থরূপে বর্ণনা করা হয়েছে—তা-ই প্রকৃত জীবনী। নিজের জীবনের সমগ্র ঘটনা যথার্থরূপে মানুষ কেবল নিজেই জানতে পারে। অন্যেরা শুধুমাত্র তার বাইরের কার্যাবলি দেখে নিজেদের বুদ্ধি অনুসারে তার সম্পর্কে অনুমানই করতে পারে, যা অধিকাংশ সময়েই যথার্থ হয় না। আজকাল যে সব জীবনী লেখা হয়, তার মধ্যে দোষগুলিকে আড়াল করে গুণসমূহের অতিরঞ্জিত মিথ্যা বর্ণনা দেওয়ার ফলে সেগুলি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ বা পূর্ণরূপে সত্য হয় না। প্রকৃতপক্ষে মর্যাদা-পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রের তুলনায় অধিক মহিমান্বিত আর কার চরিত্রই বা হতে পারে ? সুতরাং তাঁর চরিত্রই পাঠ বা শ্রবণ এবং সেই অনুসারে নিজেদের জীবন গঠন করা উচিত। যাঁদের আমরা মহাত্মা বলে মনে করি, তাঁদের সিদ্ধান্ত এবং উপদেশই শ্রেষ্ঠ, সেই অনুসারে নিজেদের জীবন গড়ে তোলার চেষ্টাই করা উচিত।

উপরে কথিত সকল বিষয়ে বিবেচনা করে আমি পরিচিত সকল সাধু-মহাত্মা তথা সদ্‌গৃহস্থগণের সমীপে একটি বিনম্র নিবেদন রাখছি। এরমধ্যে সমস্ত কথাই আমি আমার ব্যক্তিগত পরিপ্রেক্ষিতে বলেছি—অর্থাৎ আমি আমার ব্যক্তিগত চিত্র, স্মারক, জীবনী প্রভৃতি সম্পর্কেই

নিষেধ উচ্চারণ করেছি। আমার শারীরিক অক্ষমতার সময় তথা শরীর-পাতের পর এই শরীর সম্পর্কে আপনাদের দায়িত্ব বা করণীয় কী হবে— সে বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশিকা রেখে যাওয়ার জন্যই লিখিত আকারে এই বক্তব্য উপস্থাপন করা গেল।

(১)

যদি এই শরীর চলা-ফেরা বা ওঠা-বসা প্রভৃতিতেও অসমর্থ হয়ে পড়ে এবং বৈদ্য-ডাক্তারদের অভিমত অনুসারে এই শরীরের জীবিত থাকার কোনো আশা দেখা না যায়, তাহলে একে মা-গঙ্গার কূলে নিয়ে যেতে হবে। সে সময়ে কোনোরকম ঔষধাদি প্রয়োগ না করে কেবলমাত্র গঙ্গাজল এবং তুলসীদলই প্রয়োগ করতে হবে। তখন অনবরত ভগবন্নাম জপ ও কীর্তন এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম, শ্রীরামচরিতমানস প্রভৃতি পূজ্য গ্রন্থসমূহ পাঠ করে শ্রবণ করাতে হবে।

(২)

এই শরীর নিষ্প্রাণ হয়ে গেলে এর ওপর গোপীচন্দন এবং তুলসীমালা ভিন্ন পুষ্প, আতর, আবির ইত্যাদি একেবারেই দেওয়া চলবে না। প্রাণহীন সেই শরীরটিকে সাধু-পরম্পরা অনুসারে কাপড়ের ঝুলিতে করেই নিয়ে যেতে হবে, কাষ্ঠনির্মিত বৈকুণ্ঠী (বহনোপযোগী বিমান অর্থাৎ অলংকৃত খাট বা দোলা) জাতীয় কোনো বাহনে স্থাপন করে নয়।

এই শরীরের জীবিত অবস্থায় আমি যেমন চরণ-স্পর্শ, দণ্ডবৎ-প্রণাম, প্রদক্ষিণ, মাল্যার্পণ, নিজ নামে জয়ধ্বনি প্রভৃতি বরাবর নিষেধ করে এসেছি, শরীর নিষ্প্রাণ হওয়ার পরেও সেই নিষেধ যথারীতি বলবৎ থাকবে বলে বুঝতে হবে।

এই শরীরের জীবিত বা মৃত অবস্থার তথা অন্তিম সংস্কার প্রভৃতির ছবি (ফটো) নেওয়া আমি সর্বপ্রকারে নিষেধ করে যাচ্ছি।

(৩)

আমার আন্তরিক ইচ্ছা যে, অন্য কোনো শহরে বা গ্রামে এই শরীরের চিরশান্তিলাভ ঘটলে একে কোনো বাহনে করে মা-গঙ্গার তটে নিয়ে এসে সেখানেই এর অন্তিম সংস্কার করতে হবে। যদি কোনো অপরিহার্য কারণে তা কোনোমতেই করা সম্ভব না হয়, তাহলে যে শহর বা গ্রামে এই ঘটনা ঘটবে সেখানেই গোরুদের গ্রাম থেকে জঙ্গলে যাতায়াতের পথে (গোয়া) অথবা নগর বা গ্রামের বাইরে যেখানে গোরুরা বিশ্রাম নেয়, সেখানে সূর্যদেবকে সাক্ষী রেখে এই শরীরের অন্তিম সংস্কার করতে হবে। এই শরীরের অবসানের পর কারো জন্যই প্রতীক্ষা করার প্রয়োজন নেই।

অন্তিম-সংস্কার পর্যন্ত কেবল ভজন-কীর্তন, ভগবন্নাম-জপাদির অনুষ্ঠানই কাম্য এবং শেষ কাজ যেন অত্যন্ত অনাড়ম্বরভাবে সম্পন্ন করা হয়।

(৪)

অন্তিম সংস্কারের সময় এই শরীরের নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যসমূহ (কাপড়, খড়ম, জুতা প্রভৃতি) এই শরীরের সঙ্গেই অগ্নিসাৎ করতে হবে এবং অন্যান্য অবশিষ্ট সামগ্রী (বই, কমণ্ডলু প্রভৃতি) পূজার জন্য বা স্মৃতিরক্ষার জন্য রাখা চলবে না, বরং সেগুলি যেন সাধারণভাবে যথোপযোগী ব্যবহারে লাগানো হয়।

(৫)

যে স্থানে এই শরীরের অন্তিম সংস্কার করা হবে, সেখানে যেন আমার স্মৃতিরক্ষার জন্য কোনো কিছু নির্মাণ না করা হয়, এমনকী সেই স্থানে প্রস্তর খণ্ড ইত্যাদিও রাখতে আমি নিষেধ করছি। অন্তিম সংস্কারের পূর্বে সেই স্থান যেমন উপেক্ষিত ছিল, এই দেহের শেষ সংস্কারের পরেও সেই স্থান যেন তেমনই উপেক্ষিত থাকে। শেষ কাজের পর অস্থি প্রভৃতি অবশিষ্ট পদার্থ গঙ্গাস্রোতে ভাসিয়ে দিতে হবে।

আমার স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে কোথাও গোশালা, পাঠশালা,

চিকিৎসালয় প্রভৃতি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানও যেন স্থাপিত না হয়। জীবদ্দশায়ও আমি নিজের প্রয়োজনে কখনো কোথাও কোনো গৃহাদি নির্মাণ করাইনি এবং এই জাতীয় কাজের জন্য কাউকে প্রেরণাও দিইনি। যদি কোথাও কোনো ব্যক্তি কোনো ভবনাদি আমারা দ্বারা অথবা আমার প্রেরণায় নির্মিত বলে প্রচার করে, তাহলে তা সর্বৈব মিথ্যা বলে বুঝতে হবে।

(৬)

এই শরীর যাওয়ার পর সপ্তদশী (ভান্ডারা), মেলা বা মহোৎসব জাতীয় কোনো অনুষ্ঠান যেন একেবারেই না করা হয় এবং ওই দিনগুলিতে কোনো প্রকার মিষ্টান্নাদিও যেন তৈরি করা না হয়। সাধু-সন্তেরা এতদিন যেমন আমার সামনে ভিক্ষা নিয়ে আসতেন, সেই রকমই যেন নিয়ে আসেন। তবে কোনো সদ্‌গৃহস্থ নিজে থেকেই সন্তদের জন্য ভিক্ষা নিয়ে এলে তা যেন গ্রহণ করা হয়, তবে দেখা দরকার তাতে যেন কোনো মিষ্টান্ন না থাকে। সেইসময়ে কোনো সাধু বা সদ্‌গৃহস্থ বাইরে থেকে এসে উপস্থিত হলে তাঁদের ভোজনের ব্যবস্থায় যেন মিষ্টান্ন প্রস্তুত না করা হয়, বরং তাঁদের জন্যও সাধারণ ভোজনেরই ব্যবস্থা করা হয়।

(৭)

এই শরীর নাশের পর শোকপ্রকাশ বা শোকসভা ইত্যাদির অনুষ্ঠান যেন না করা হয়, বরং সতেরো দিন ধরে সৎসঙ্গ, ভজনকীর্তন, ভগবন্নামজপ, গীতা, শ্রীরামচরিতমানস, মহাপুরুষগণের বাণী, ভাগবত প্রভৃতি পাঠ এবং এই জাতীয় আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। সনাতন হিন্দু সংস্কৃতি অনুসারে এই দিনগুলিতে এইগুলিই প্রধান কর্তব্য বলে স্বীকৃত।

(৮)

এই শরীর বিলীন হয়ে যাওয়ার পর সপ্তদশী ইত্যাদি কোনো উপলক্ষে যদি কোনো সজ্জন টাকাপয়সা, কাপড় ইত্যাদি কোনো বস্তু উপহার দিতে চান, তাহলে তা যেন গ্রহণ না করা হয়, অর্থাৎ কারো কাছ থেকেই কোনো রকম উপহার বা দান যেন না নেওয়া হয়। যদি কেউ বলেন যে

তিনি মন্দিরে প্রণামী নিবেদন করছেন, তাহলেও তা অসার বক্তব্য বলে তার বিরোধিতা করতে হবে। বাইরে থেকেও যদি কেউ কোনো মাধ্যমের দ্বারা কোনোরকম দান বা উপহার প্রেরণ করে, তা-ও সর্বথা অস্বীকার করতে হবে। কারো কাছ থেকে উপহার গ্রহণ না করার সঙ্গে সঙ্গে কাউকে কোনো উপহার, চাদর বা দক্ষিণা প্রভৃতি না দেওয়া হয়, সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। সপ্তদশী অনুষ্ঠান নিষেধের দ্বারা বার্ষিক তিথিপালন ইত্যাদিরও নিষেধ বুঝতে হবে।

(৯)

এই শরীর অপ্রকট হওয়ার পর এর (শরীর) সঙ্গে সম্পর্কিত ঘটনাবলি, জীবনী, স্মারকগ্রন্থ, স্মৃতিকথা ইত্যাদি কোনোরূপেই প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় নয়।

পরিশেষে আমি আমার পরিচিত সকল সাধু-সন্ত এবং সদ্গৃহস্থগণের কাছে এই বিনীত নিবেদন রাখছি যে, আমি যে বিষয়গুলি নিষেধ করেছি, কোনো পরিস্থিতিতেই যেন সেগুলি না করা হয়। এই শরীরের প্রয়াণের পর এই নির্দেশগুলির বিপরীত আচরণের দ্বারা তথা কোনো প্রকার বিবাদ, বিরোধ, মতভেদ, ঝগড়া, বিতর্ক, ইত্যাদি অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতি তৈরি করে নিজেকে অপরাধ এবং পাপের ভাগী না করে বিশেষ ধৈর্য, প্রীতি, সরলতা এবং পারস্পরিক বিশ্বাস, অকপট ব্যবহারের সঙ্গে পূর্বোক্ত নির্দেশাবলি পালন করে ভগবন্নামকীর্তন-সহকারে অন্তিম সংস্কারের কাজটি যেন সম্পন্ন করা হয়। যখন যেখানেই এইরকম যোগাযোগ হোক, এই শরীর সম্পর্কে প্রদত্ত নির্দেশ সেখানে উপস্থিত সকল সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তির পক্ষেই পালনীয় বলে বিবেচনা করতে হবে।

আমার জীবনকালে আমার শরীর, বাক্য অথবা মনের দ্বারা, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যদি কারো কোনো কষ্টের হেতু হয়ে থাকি, তাহলে তাদের সবার কাছে যুক্তকরে নম্র হৃদয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করছি। আশা করি, সকলেই উদারতার সঙ্গে আমাকে ক্ষমা করবেন।

স্বাঃ—**রামসুখদাস**

অন্তিম প্রবচন

(২৯.৬.২০০৫, সময়—বিকাল ৪টা)

এক অতি উৎকৃষ্ট, অত্যন্ত সহজসাধ্য, অত্যন্ত সরল কথা আছে। তা হল এই যে, কোনোরকমের কোনো ইচ্ছা রেখো না। না পরমাত্মার, না আত্মার, না সংসারের, না মুক্তির, না কল্যাণের—কোনো কিছুরই ইচ্ছা কোরো না আর চুপ হয়ে যাও। শান্ত হয়ে যাও। কারণ পরমাত্মা সর্বত্রই শান্তরূপে পরিপূর্ণ হয়ে আছেন। স্বতঃ স্বাভাবিকভাবেই সব জায়গায় পরিপূর্ণ হয়ে আছেন। কোনো ইচ্ছা যদি না থাকে, কোনোরকমের কোনো কামনা যদি না থাকে, তো একদম পরমাত্মার প্রাপ্তি হয়ে যায়, তত্ত্বজ্ঞান হয়ে যায়, পূর্ণতা লাভ হয়ে যায়।

সকলেরই জানা আছে যে কোনো ইচ্ছা পূর্ণ হয়, আবার কোনোটা বা হয় না। সব ইচ্ছাই পূর্ণ হবে এমন কোনো নিয়ম নেই। সব ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারা আমাদের সাধ্যের মধ্যে নেই, কিন্তু ইচ্ছাগুলোকে ত্যাগ করা আমাদের আয়ত্তে। কোনো ইচ্ছা, কোনো চাহিদা যদি না থাকে তো তোমার স্বতঃই পরমাত্মাতে স্থিতি হবে। পরমাত্মতত্ত্বের অনুভব হবে। কিছু চেয়ো না, কিছু কোরো না, কোথাও যেয়ো না, কোথাও এসো না, কোনো অভ্যাস কোরো না। ব্যস, এইটুকুই কথা। এতেই সব কথা বলা হয়ে গেল। ইচ্ছা করেছি বলেই আমরা সংসারে বাঁধা পড়েছি। ইচ্ছাকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়ামাত্রই সর্বত্র পরিপূর্ণ পরমাত্মাতে স্বতঃস্বাভাবিক স্থিতি।

প্রতিটি কাজেই তটস্থ (নিরপেক্ষ, সাক্ষিস্বরূপ) থাকো। আসক্তি বা বিদ্বেষ কিছুই কোরো না।

তুলসী মমতা রাম সোঁ, সমতা সব সংসার।

রাগ ন রোষ ন দোষ দুখ, দাস ভএ ভব পার॥ (দোহাবলী ৯৪)

এক আছে ক্রিয়া, আর এক আছে পদার্থ। ক্রিয়া এবং পদার্থ—এই হল প্রকৃতি। ক্রিয়া এবং পদার্থ—এই দুইয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ করে এক ভগবানের আশ্রয়ে চলে যাও। ভগবানের শরণ নাও, ব্যস। তাঁতে

তোমার স্থিতি তো স্বতঃসিদ্ধ। **'ভূমা অচল শাশ্বত অমল সম ঠোস হৈ তূ সর্বদা'**—এইরকম পরমাত্মাতে তোমার স্বাভাবিক স্থিতি। স্বপ্নে এক স্ত্রীলোকের পুত্র হারিয়ে গেছিল। সে তো ভীষণ ব্যাকুল হয়ে পড়ল। কিন্তু যখন নিদ্রা ভাঙল তখন দেখতে পেল ছেলে তার পাশেই শুয়ে ঘুমিয়ে আছে। এর তাৎপর্য হল—যেখানে তুমি আছো সেখানেই পরমাত্মা পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান আছেন। যেখানে আছো, সেখানেই চুপ হয়ে যাও !

(৩০.৬.২০০৫, সময়—সকাল ১১টা)

শ্রোতা—কাল আপনি বলেছিলেন কোনো চাওয়া রেখো না। ইচ্ছা ত্যাগ করা আর চুপ (অন্তরে-বাহিরে) হয়ে যাওয়া—দুইয়ের মধ্যে কোনটাতে বেশি লাভ হয় ?

স্বামীজী—আমি ভগবানের, ভগবান আমার, আমি আর কারো নই, আর কেউ আমার নয়—এইরকম ভাব আশ্রয় করে থাকো। ইচ্ছারহিত হওয়া আর চুপ হয়ে যাওয়া একই কথা। কোনো ইচ্ছাই করা চলবে না, না ভোগের, না মোক্ষের, না প্রেমের, না ভক্তির, না অন্য কোনো কিছুর।

শ্রোতা—ইচ্ছা করা চলবে না, কিন্তু কোনো কাজ করতে হলে ?

স্বামীজী—কাজ করো উৎসাহের সঙ্গে, আট প্রহর ধরে করো, কিন্তু কোনো ইচ্ছা কোরো না। এই কথাটা ভালোভাবে বোঝো। অন্যের সেবা করো, তার দুঃখ দূর করো, কিন্তু তার বিনিময়ে কিছু চেয়ো না। সেবা করো, শেষে চুপ হয়ে যাও। কোথাও চাকরি করো তো, মাইনে ঠিকই নিয়ে নাও, কিন্তু ইচ্ছা রেখো না।

সার কথা হল, যেখানে তুমি আছো, সেখানেই পরমাত্মা আছেন। কোনো ইচ্ছা যদি না করো তো তোমার স্থিতি পরমাত্মাতেই হবে। সবই যখন পরমাত্মা, তখন আবার কীসের ইচ্ছা করব ? সংসারের ইচ্ছা আছে, এইজন্যই আমরা সংসারে আছি। কোনো ইচ্ছা না থাকলে আমরা পরমাত্মার মধ্যেই রয়েছি।

———○———